PAPER CUTTING

January 2023

সম্পাদকীয়

আনন্দবাজার পত্রিকা

WBCS Bengali Compulsory Paper

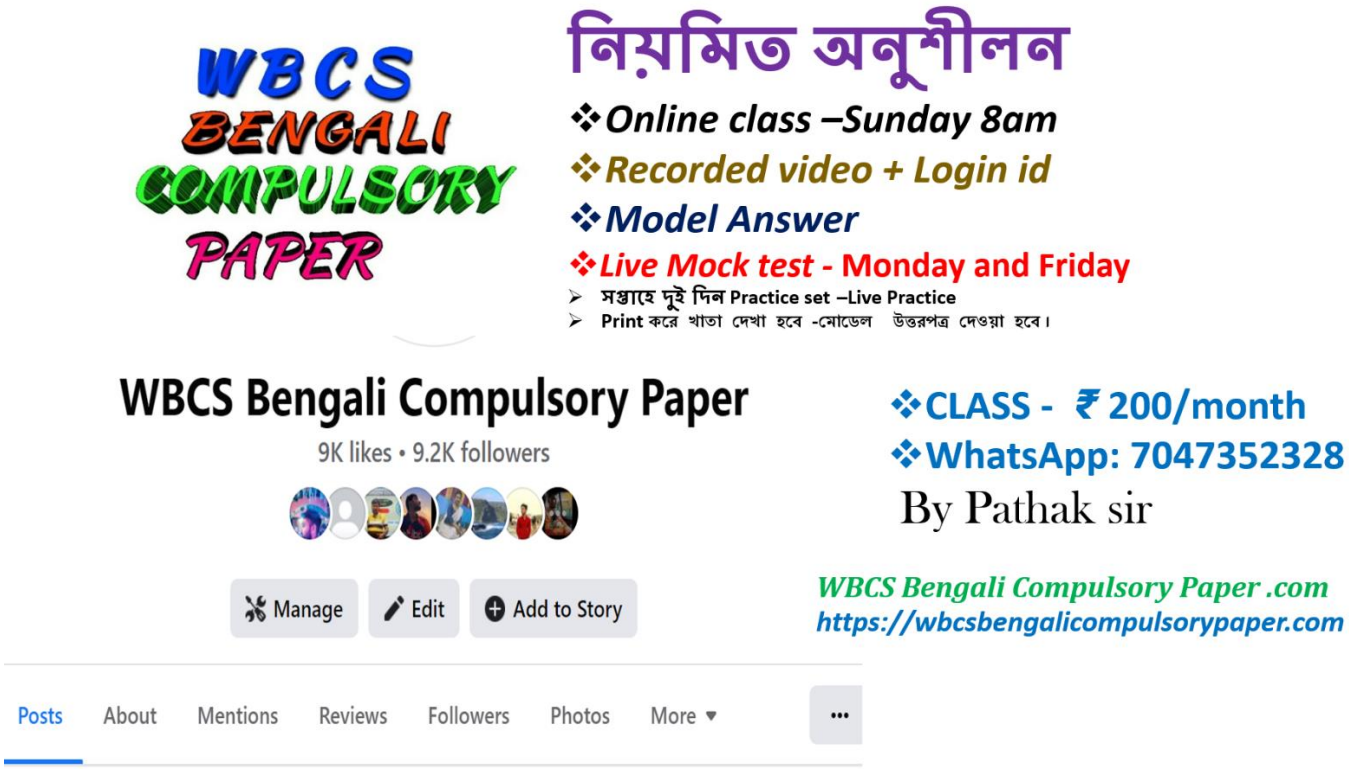

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

নিয়ন্ত্রণের বাসনা

হচ্ছিল অনলাইন জুয়া সংক্রান্ত আইনের আলোচনা। কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড ইনফর্মেশন টেকনোলজি মন্ত্রক তথ্যপ্রযুক্তি আইনের সেই খসড়া সংশোধনীর পাদটীকা হিসাবে জুড়ে দিল একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন শর্ত— অতঃপর প্রেস ইনফরমেশন বুরো (পিআইবি) বা অন্য কোনও সরকার-মনোনীত সংস্থা এই ক্ষমতার অধিকারী হবে যে, তারা কোনও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সরকার সংক্রান্ত কোনও তথ্যকে ‘ফেক নিউজ়’ বা ভুয়ো খবর বলে চিহ্নিত করলে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটের পরিচালকদের সেই সংবাদটি সরিয়ে নিতে হবে। বর্তমান সময়ে ভুয়ো খবরের বিপদ নিয়ে কোনও সংশয় নেই, তাকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তাও প্রশ্নাতীত। কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ পিআইবি-র হাতে সে-হেন দায়িত্ব অর্পণ ভুয়ো খবর নিয়ন্ত্রণে যতখানি সচেষ্ট বা সক্ষম হবে, সরকার-বিরোধী কণ্ঠস্বর দমনে তার চেয়ে অনেক বেশি তৎপর হবে কি না, সেই প্রশ্নটিকে উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ বর্তমান ভারতে নেই। শুধু সোশ্যাল মিডিয়া নয়, আজ দেশের প্রায় সব সংবাদমাধ্যম অনলাইনে উপস্থিত। এই অবস্থায় পিআইবি বা সরকার-মনোনীত অন্য কোনও সংস্থার যদি এই অধিকার থাকে যে, তারা যে কোনও সংবাদকে সরিয়ে নিতে বলতে পারে, তা এক বিপুল সেন্সরশিপ-এর জন্ম দেবে। কোন সংবাদ প্রকাশিত হবে, আর কোনটি হবে না, তার নিয়ন্ত্রণ পিআইবি-র বকলমে সরকারের হাতে থাকবে। উল্লেখ্য যে, পিআইবি এখনই ভুয়ো তথ্য চিহ্নিত করার কাজ করে। একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে পিআইবি যথাযথ সংবাদকে ভুয়ো খবর হিসাবে চিহ্নিত করেছে। তার হাতে সেন্সরশিপের এমন প্রবল ক্ষমতা তুলে দেওয়া সুবিবেচনার পরিচয় হতে পারে না।

এই খসড়া সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে, পিআইবি বা সরকার-মনোনীত অন্য কোনও সংস্থা যে ভুয়ো খবর অপসারণের নির্দেশ দিতে পারে, সেগুলি সরকারের কাজকর্ম সংক্রান্ত। আশঙ্কা হয়, সরকারের পক্ষে যে সংবাদ বা মতামত যথেষ্ট ইতিবাচক হিসাবে বিবেচিত হবে না, সেগুলি ‘ভুয়ো’ হিসাবে চিহ্নিত হবে। প্রবণতাটির মধ্যে কর্তৃত্ববাদী শাসনের চরিত্রলক্ষণ স্পষ্ট। সরকার সম্বন্ধে সমালোচনার ক্ষেত্রে বর্তমান শাসকদের অসহিষ্ণুতা ইতিমধ্যেই বহু বার প্রকট হয়েছে। এমনকি, সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম কোনও বিচারপতির বিষয়ে সুপারিশ করার পরও কেন্দ্রীয় সরকার আপত্তি জানিয়ে বলেছে যে, তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে সমালোচনামূলক সংবাদ শেয়ার করেছেন! অনুমান করা চলে যে, পিআইবি-র হাতে যে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার কথা বিবেচনা করছে কেন্দ্র, তা সমালোচনা দমন করার এই মানসিকতাকেই আরও পরিপুষ্ট করবে।

আশঙ্কা হয়, সরকারের লক্ষ্য হল নাগরিকের বাক্‌স্বাধীনতা হরণ। গণতন্ত্রে বাক্‌স্বাধীনতার গুরুত্ব সংবিধানের ১৯ ধারায় স্বীকৃত। সেই স্বাধীনতা অবশ্যই অ-বাধ নয়। ১৯(২) ধারায় নির্দেশ রয়েছে, দেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, আইনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও আদালত অবমাননার প্রশ্নে নাগরিকের বাক্‌স্বাধীনতা খণ্ডন করতে পারে সরকার। লক্ষণীয় যে, সরকারের সমালোচনাকে দমন করার জন্য বাক্‌স্বাধীনতা হরণের অধিকার সংবিধান দেয়নি। সুপ্রিম কোর্ট তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬এ ধারাকে অবৈধ ঘোষণা করেছিল, কারণ আদালতের মতে তা যে ভাবে নাগরিকের বাক্‌স্বাধীনতা হরণ করে, তার অধিকার সংবিধানের ১৯(২) ধারা দেয়নি। পিআইবি-র হাতে সেন্সরশিপের ক্ষমতা তুলে দিয়ে সরকার যে পথে হাঁটার কথা ভাবছে, তা সংবিধানস্বীকৃত কি না, সেই বিচারের অধিকার শীর্ষ আদালতের। কিন্তু, নিয়ন্ত্রণের এই প্রবণতাকে বারংবার প্রশ্ন করা নাগরিকের কর্তব্য। ক্ষমতাবানকে অপ্রিয় প্রশ্ন করতে পারার স্বাধীনতাই গণতন্ত্রকে অর্থপূর্ণ রাখতে পারে।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Girl Child অনাদর

পশ্চিমবঙ্গে শিশুকন্যার অনুপাত কমছে, এই তথ্য উদ্বেগজনক। সারা দেশে যেখানে শিশুকন্যার জন্মকালীন অনুপাত ২০১৮ সালের তুলনায় ২০২০ সালে বেড়েছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে তা কমেছে। যদিও জাতীয় গড়ের (প্রতি হাজার শিশুপুত্রে ৯০৭ কন্যা) তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের গড় (প্রতি হাজার শিশুপুত্রে ৯৩৬) অনেক উন্নত, তবুও প্রশ্ন করতেই হয়, ২০১৮ সালের গড় (প্রতি হাজারে ৯৪৪ শিশুকন্যা) থেকেও কেন কমল পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের অনুপাত? মনে রাখা দরকার, পুত্র বা কন্যার চাহিদা, এবং জনসংখ্যায় তার প্রতিফলন, একটি বহুমাত্রিক ও দীর্ঘমেয়াদি বিষয়। চটজলদি বিশ্লেষণ বা সমাধান করা সম্ভব নয়। সরকার সাধারণত বিষয়টিকে আইনশৃঙ্খলার সমস্যায় পর্যবসিত করে। গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গনির্ধারণ ও কন্যাভ্রূণের বিনাশ নিষিদ্ধ করে আইন হয়েছে ১৯৯৪ সালে। তা সত্ত্বেও ওই প্রযুক্তির ব্যবহার অপ্রতিহত, ভারতের বিপুল সংখ্যক ‘নিখোঁজ কন্যা’ তার সাক্ষী। অতএব কোথাও শিশুকন্যার অনুপাত কমলেই নতুন করে নজর পড়ে অসাধু চিকিৎসক ও ক্লিনিকগুলির দিকে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় প্রাপ্ত পশ্চিমবঙ্গের সর্বশেষ জন্মকালীন লিঙ্গ বিষয়ক তথ্য সামনে আসার সঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তারাও নজরদারি বাড়ানোর কথা বলেছেন। সন্দেহ নেই যে ভারতে লিঙ্গনির্ধারণ ও গর্ভপাত একটা শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছেছে। তার নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গেও তার প্রকোপ যথেষ্ট। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা দেখাচ্ছে, ২০১৮-২০২০ সালে পশ্চিমবঙ্গে শিশুকন্যার অনুপাত ৯৪১, শহর এলাকায় ৯২০। উচ্চপ্রযুক্তি নাগালে থাকায় বহু দম্পতি ‘পছন্দ’ অনুসারে পরিবার তৈরি করছেন, যেখানে পুত্রই অভিপ্রেত।

কিন্তু তিন দশকের অভিজ্ঞতা বলে যে ক্লিনিকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার কাজে সরকারের সাফল্য অতি সামান্য। সামগ্রিক ভাবে চিকিৎসক সমাজ তার বিরোধিতাই করে এসেছে, চিকিৎসক সংগঠনগুলি বার বার অভিযুক্তদের সপক্ষে দাঁড়িয়েছে, অভিযুক্তকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া যায়নি। অতএব কেবল ক্লিনিকে নজরদারিই যথেষ্ট নয়। বিশেষজ্ঞরা জনসংখ্যার বিশ্লেষণ করে, এবং সমীক্ষার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তেও পৌঁছেছেন যে, কেবল লিঙ্গ-নির্ণয় ও গর্ভপাত দিয়ে শিশুকন্যার অনুপাত কমে আসাকে ব্যাখ্যা করা চলে না। বহু দম্পতি একটি পুত্রসন্তান জন্মালে আর সন্তান চান না। তাঁরা দীর্ঘমেয়াদি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এর ফলেও কন্যাসন্তানের জন্ম কমছে।

অতীতে শিশুকন্যার স্বাস্থ্যের প্রতি উপেক্ষা করে, তার চিকিৎসায় অবহেলা করে মৃত্যু ত্বরান্বিত করার চেষ্টাও দেখা গিয়েছে। সেই ঝোঁক এখন কমেছে, তা-ও বলা চলে না। এ বারের নমুনা সমীক্ষাতেও পশ্চিমবঙ্গ-সহ নানা রাজ্যে শিশুপুত্রের তুলনায় কিছু বছরে শিশুকন্যার মৃত্যুহার বেশি। আসল প্রশ্নটি মৌলিক। তা হল, শিশুকন্যার প্রতি পরিবারের আগ্রহ বাড়ছে না কেন? পশ্চিমবঙ্গে যে নাবালিকা বিবাহ, অকালমাতৃত্ব বেশ কিছু জেলায় বেড়েছে, তা থেকে শিশুকন্যার অনুপাতের পতনকে আলাদা করে দেখা চলে না। মেয়েদের শিক্ষার হারে উন্নতির একটি সুফল, সন্তানসংখ্যায় হ্রাস। অথচ, মেয়েদের শিক্ষায় উন্নতি, পরিবারের দারিদ্র নিরসন, কোনও কিছুর সঙ্গেই শিশুকন্যার সংখ্যায় বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে না। লিঙ্গসাম্যের পথ এমনই দীর্ঘ ও কঠিন।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Citizenship অস্বীকার

রাষ্ট্রের কাছে নাগরিক যা দাবি করে, অথবা কল্যাণরাষ্ট্র নাগরিককে যা দেয়, তার সবটাই ‘নাগরিকের অধিকার’ বলে দেগে দিলে ‘অধিকার’ কথাটি লঘু হয়ে যায়। কোনও পরিস্থিতিতেই নাগরিককে যা থেকে রাষ্ট্র বঞ্চিত করতে পারে না, প্রকৃত প্রস্তাবে সেটাই অধিকার। এই সংজ্ঞা অনুসারেও অবশ্য খাদ্যকে নাগরিকের অধিকার হিসাবে স্বীকার করাই বিধেয়। বলা যেত, আগামী এক বছর দেশে ৮০ কোটিরও বেশি দরিদ্র মানুষকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়ার সিদ্ধান্তটি নাগরিকের সেই অধিকারই স্বীকার করে নিল। খাদ্য সুরক্ষা আইনের মাধ্যমে পূর্বতন ইউপিএ সরকার যে পথে হেঁটেছিল, প্রায় এক দশক বিলম্বে হলেও মোদী সরকার উন্নয়নের সেই পথের ধারাবাহিকতা বজায় রাখল। কিন্তু, দু’টি কারণে এই কথা বলা মুশকিল। প্রথমত, সিদ্ধান্তটির মধ্যে ভোটের গন্ধ বড় বেশি প্রকট। প্রধানমন্ত্রী মোদী সাধারণ মানুষের খাদ্যের অধিকারকে গুরুত্ব দেন, অতিমারির ধাক্কা লাগার আগে এমন প্রমাণ খুব একটা মেলেনি। বরং, এই জাতীয় প্রকল্পকে যে তিনি কংগ্রেস জমানার ব্যর্থতার অভিজ্ঞান মনে করেন, সে কথা বলার কারণ আছে। লোকসভা নির্বাচনের মুখে এক বছরের জন্য বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বণ্টনের সিদ্ধান্তটির পিছনে কল্যাণরাষ্ট্রের কর্তব্য বা নাগরিকের অধিকার সম্বন্ধে বোধ যতখানি, সংশয় হয়, তার চেয়ে বেশি রয়েছে অন্নদাতা হিসাবে আত্মপ্রচারের তাগিদ।

দ্বিতীয় কারণটি নিহিত রয়েছে সরকারের বক্তব্যে। সরকারের মতে, এই সিদ্ধান্ত গরিব মানুষদের প্রতি ‘নতুন বছরের উপহার’। অর্থাৎ, এক বছরের জন্য অন্নের ব্যবস্থা হওয়াকে সরকার নাগরিকের অধিকার হিসাবে নয়, দেখছে সরকারের বদান্যতা হিসাবে। উৎসবের দিনে, ভরসাফুর্তির দিনে প্রজাকে ‘উপহার’ দেওয়া— রাজসমৃদ্ধি থেকে দু’মুঠো খুদকুঁড়ো ছুড়ে দেওয়া প্রজার দিকে— এ অভ্যাস রাজতন্ত্রের, গণতন্ত্রের নয়। অনুমান করা চলে, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার দেশের মানুষকে নাগরিক নয়, প্রজা জ্ঞান করে। অবশ্য, এ দোষে কেবল কেন্দ্রীয় সরকারই দুষ্ট, বললে অন্যায় হবে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে তামিলনাড়ু, দিল্লি থেকে ছত্তীসগঢ়, যে রাজ্যের দিকেই চোখ পড়বে, সেখানেই সরকারের ভঙ্গিটি রাজার মতো— কেউ প্রজাকে মাসোহারা দেয়, কেউ মকুব করে দেয় বিজলির বিল। প্রজার অধিকার থাকে না, তার ভরসা শুধু বদান্যতা। ফলে, দেশের সরকারের এই দেখার ভঙ্গি নাগরিকের অধিকারের প্রশ্নটিকে অপ্রাসঙ্গিক করে দেয়। এই বদান্যতার আয়ু কত? রাজজ্যোতিষী বলতেন, যত ক্ষণ, তত ক্ষণ।

অধিকারের প্রশ্নটিকে ভারতের রাজনৈতিক চর্চার একেবারে কেন্দ্রে নিয়ে আসা ছিল উন্নয়ন অর্থনীতির পরিসরে মনমোহন সিংহ সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অতি-ব্যবহারে ‘অধিকার’ কথাটির গুরুত্ব সে জমানায় কিঞ্চিৎ লঘু হয়েছিল— কিন্তু, রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকের যা প্রাপ্য, তা ক্ষমতাসীন দলের বদান্যতার উপর নির্ভর করে না, সাম্প্রতিক কালে গোটা দুনিয়ায় কোথাও এই কথাটি এত স্পষ্ট ভাবে বলা হয়নি। গত পৌনে নয় বছর সেই অর্জনকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। অবশ্য শুধু ভারতে নরেন্দ্র মোদীর শাসনেই নয়, গোটা দুনিয়াতেই কর্তৃত্ববাদী শাসকরা অধিকারের প্রশ্নটিকে সরকারের বদান্যতায় নামিয়ে আনতে পেরেছেন। অতীতেও, আজও। ১৯২০-৩০’এর জার্মানির ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টির বহু নীতিতে যেমন নাগরিকের প্রতি বদান্যতা ছিল, আজকের তুরস্কে রিসেপ তায়িপ এর্দোয়ানের নীতিতেও রয়েছে। কিন্তু, এই শাসনগুলির কোনওটিই রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকের অধিকারের প্রশ্ন স্বীকার করে না। ভারতের ৮০ কোটি গরিব মানুষকে নতুন বছরের উপহার হিসাবে বিনামূল্যে চাল-গম দেওয়ার মধ্যেও সেই অস্বীকারই প্রকট।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Road accidents মৃত্যু-পথ

অতিমারির বছরটিতে প্রায়-গৃহবন্দি রাজ্যে স্বাভাবিক ভাবেই কমেছিল পথ-দুর্ঘটনার সংখ্যা, কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রক সম্প্রতি ২০২১ সালের দেশব্যাপী পথ-দুর্ঘটনার খতিয়ান প্রকাশ করেছে। সেখানেই দেখা যাচ্ছে, শুধু ওই বছরটিতেই পশ্চিমবঙ্গে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে ১০৪৫৪টি, প্রাণ হারিয়েছেন ৫৮০০ জন মানুষ! এঁদের মধ্যে সিংহভাগই— ২৯১১ জন পথচারী। কী ধরনের সড়ক দুর্ঘটনায় পথচারীরা মারা যাচ্ছেন, সেই শ্রেণিবিন্যাসও উল্লিখিত রিপোর্টে— ১৭২২ জনের মৃত্যু হয়েছে গাড়ি বা ট্যাক্সির ধাক্কায়, বাইকের ধাক্কায় মৃত ৮৩০ জন, ট্রাক-লরি দুর্ঘটনায় ৬১৪ জন, বাসের ধাক্কায় একশোর কাছাকাছি, এমনকি অটো দুর্ঘটনাও কাড়ছে পথচারীর প্রাণ। গাড়ি, ট্যাক্সি, বাইক, অটো, টোটো, ই-রিকশা, সাইকেল— বিভিন্ন যানবাহনের চালক বা যাত্রীদেরও প্রাণ যাচ্ছে দুর্ঘটনায়, বাইক-আরোহীদের সবচেয়ে বেশি— কিন্তু তার পাশে পথচারীদের মৃত্যুর সংখ্যাটি এতই যে, আতঙ্ক হয়, এ রাজ্যে পথে নামা মানেই কি প্রাণ হাতে বেরোনো!

এক বছরে প্রতি দিন গড়ে ১৫ জন মানুষের পথ-দুর্ঘটনায় মৃত্যু, আতঙ্কের কারণই বটে। পরিসংখ্যান বলছে, দুর্ঘটনার বেশির ভাগই ঘটে কেন্দ্র ও রাজ্যের দায়িত্বে থাকা জাতীয় সড়কে, এবং যে দশটি রাজ্যে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় প্রাণহানির সংখ্যা সর্বাধিক, তাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে দশ নম্বরে। অন্য বহু রাজ্যে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা অনেক বেশি, এ রাজ্যে কম বলে আনন্দের কোনও কারণ নেই; বছরের সার্বিক পথ-দুর্ঘটনার সংখ্যাটি ক্ষুদ্র হলে বরং সন্তুষ্টির অবকাশ থাকত। জাতীয় সড়কের চরিত্র, রক্ষণাবেক্ষণ, সেখানে চলাচল করা যানবাহনের বিন্যাস, তাদের গতি নিয়ন্ত্রণে কঠোর নজরদারি ও প্রয়োজন মতো দণ্ডবিধান— এই সব কিছুই যথাযথ ভাবে দেখা হচ্ছে কি না, তার উপরে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেকাংশে নির্ভর করে। পশ্চিমবঙ্গ সেই সব দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমাতে পারলেও, বোঝাই যাচ্ছে, রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ছোট-বড় অন্যান্য সড়কপথে দুর্ঘটনা থামছে না।

এখন অবিলম্বে প্রয়োজন এই অন্য সড়কগুলিরও হাল ফেরানো। রাজ্য পরিবহণ দফতরের বোঝা দরকার, কেবল কলকাতা থেকে দিঘাগামী সড়ককে মসৃণ ও সুখযাত্রা-উপযোগী করাটাই কাজ নয়, গঙ্গাসাগর মেলা আসছে বলে কলকাতা থেকে কাকদ্বীপ-নামখানা অভিমুখী প্রধান সড়কপথগুলির দিকে সাময়িক নজর দিয়েই ক্ষান্ত হলে চলবে না। দরকার দার্জিলিং থেকে পুরুলিয়া এবং গঙ্গাসাগর পর্যন্ত কোন কোন প্রধান সড়কগুলি দুর্ঘটনাপ্রবণ তা খতিয়ে দেখা, এক জেলা থেকে অন্য জেলায় কিংবা আন্তঃজেলা যাতায়াত, যোগাযোগ ও অর্থনীতির জন্যও যে সড়কগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ উপেক্ষিত— অপরিসর বা মেরামতিহীন, তাদের চিহ্নিত করে সেগুলির হাল ফেরানো। পথের স্বাস্থ্যোদ্ধার, পাশাপাশি যানবাহনের নিয়মকানুন, গতিবেগ নিয়ন্ত্রণে নজরদারি, সিগন্যাল গতিরোধক ও পথনির্দেশের সুব্যবস্থা— সব কিছুই আরোহী ও পথচারীর জীবন বাঁচাবে, নান্যঃ পন্থাঃ। দুর্ঘটনাহীন সড়কপথ স্রেফ রাজ্যের পরিবহণ চিত্রেরই সুবিজ্ঞাপন নয়, রাজ্যবাসীর নিরাপদ জীবনেরও অভিজ্ঞান। নতুন বছরের গোড়া থেকেই রাজ্য সরকার এ দিকে নজর দিক। পথ পৌঁছে দিক জীবনে, তা যেন কখনও মৃত্যু-পথ হয়ে না দাঁড়ায়।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Schools অন্তর্জলি যাত্রা

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন স্তরে স্কুলশিক্ষক নিয়োগে অন্তহীন দুর্নীতির অভিযোগ ও তার নিত্যনতুন সাক্ষ্যপ্রমাণ উদ্ঘাটনের অবিরত বিভীষিকার ফাঁকে সম্প্রতি অন্য এক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে নিহিত আছে চূড়ান্ত সর্বনাশের আশঙ্কা, যে আশঙ্কা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হলে সরকারি স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে আর কোনও গোলযোগের অবকাশই থাকবে না, কারণ সরকারি স্কুলেরই আর কোনও প্রয়োজন থাকবে না। সংবাদটি এই যে, রাজ্যের নানা এলাকায় বিভিন্ন সরকারি স্কুলে আসনসংখ্যার তুলনায় ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার কম। তার ফলে, লটারির মাধ্যমে এই সব স্কুলে ভর্তির সুযোগ দেওয়ার যে ব্যবস্থা অনেক দিন যাবৎ প্রচলিত, অনেক স্কুলেই সেটি ক্রমে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে, লটারির আর প্রয়োজনই হচ্ছে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি এই পরিস্থিতির একটি কারণ হতে পারে বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই সেটি আসলে গৌণ কারণ। মুখ্য কারণ এই যে, অভিভাবকরা সন্তানদের বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করাতে চাইছেন, সরকারি স্কুলে নয়। অর্থাৎ, এক কথায়, সরকারি স্কুলের চাহিদা কমছে। কলকাতা তথা শহরাঞ্চলে এই সমস্যা স্বভাবতই বেশি, কারণ সেখানে বেসরকারি স্কুলের জোগান তুলনায় বেশি। কিন্তু গ্রামীণ এলাকাও এই প্রবণতা থেকে একেবারেই মুক্ত নয়। ইতিমধ্যেই সরকারি অর্থে চলা অনেক স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তলানিতে ঠেকেছে। এই প্রবণতা আরও প্রসারিত হলে সমস্যা আক্ষরিক অর্থেই সর্ব-নাশে পরিণত হবে।

কেন এই পরিস্থিতি? সরকারি স্কুলে পড়াশোনার খরচ বেসরকারি স্কুলের তুলনায় অনেক কম। তদুপরি ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পায়। অন্য দিকে, বেসরকারি স্কুলগুলি কেবল ব্যয়সাপেক্ষ নয়, অনেক ক্ষেত্রেই তাদের লেখাপড়ার মান নিয়েও রীতিমতো প্রশ্ন আছে। তা সত্ত্বেও অভিভাবকরা সরকারি স্কুলের প্রতি উত্তরোত্তর বিমুখ কেন? উত্তর একটাই: সেখানে পড়াশোনা হয় না। তার প্রথম এবং প্রধান কারণ, বহু স্কুলেই শিক্ষকের ঘাটতি। দীর্ঘ দিন ধরে এই ঘাটতি চলে আসছে, কিন্তু সাম্প্রতিক কালে তার মাত্রা অস্বাভাবিক বেড়েছে। এক দিকে অব্যবস্থা ও দুর্নীতির কারণে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় বড় রকমের ব্যাঘাত ঘটেছে, অন্য দিকে সরকারের হঠকারী এবং অপরিণামদর্শী নীতির ফলে গ্রামাঞ্চলের, বিশেষত শহর থেকে দূরবর্তী এলাকার বহু স্কুল থেকে শিক্ষকরা অন্যত্র বদলি নিয়ে চলে যাচ্ছেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনেক শিক্ষকের অমনোযোগ, ঔদাসীন্য এবং নির্ভেজাল ফাঁকিবাজি, যার ফলে দিনের পর দিন স্কুলে পঠনপাঠনের কাজ কিছুমাত্র হয় না। অভিভাবকরা নিরুপায় হয়েই বেসরকারি স্কুলের দিকে পা বাড়াচ্ছেন, আর্থিক সমস্যা স্বীকার করেও।

পশ্চিমবঙ্গে আরও কিছু দিন এই প্রক্রিয়া চলতে পারে, কারণ অন্য অনেক রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যে এখনও স্কুলের শিক্ষার্থীরা অনেকটা বেশি অনুপাতেই সরকারি স্কুলে পড়তে যায়, অর্থাৎ বেসরকারি স্কুলের আধিপত্য তুলনায় এখনও কম। কিন্তু সেটাই আরও বেশি পরিতাপের বিষয়। সরকারি উদ্যোগে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার একটি বিস্তীর্ণ বন্দোবস্ত আছে, স্কুলের পরিকাঠামোও অতীতের তুলনায় অনেকটা উন্নত হয়েছে, অথচ যে লেখাপড়ার জন্য স্কুল, সেখানেই বিরাট ঘাটতি তৈরি হয়েছে এবং সেই ঘাটতি বেড়েই চলেছে। এই লজ্জাকর এবং কলঙ্কজনক ব্যর্থতার ষোলো আনা না হোক পনেরো আনা দায় রাজ্য সরকারের উপরেই বর্তায়। শিক্ষাব্যবস্থা যাঁরা চালান তাঁরা সম্ভবত এই ব্যবস্থার প্রাথমিক উদ্দেশ্যটিই সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন, তা না হলে আজ এই পরিণতি হতে পারত কি? কে জানে, এমনটাই হয়তো তাঁদের পছন্দ— অন্তর্জলি যাত্রার তো কোনও পরিশ্রম নেই।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Joka-Taratala Metro কলকাতায় টয় ট্রেন

এত দিন যা ছিল শুধু পাহাড়ের গৌরব, এ বার শহর কলকাতাও সে হাসি হাসল। শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম উপান্তে চালু হল নতুন টয় ট্রেন। তার নাম অবশ্য জোকা মেট্রো। জোকা থেকে তারাতলা, মোট সাড়ে ছয় কিলোমিটার পথ; সপ্তাহে পাঁচ দিন, দশটা থেকে পাঁচটা, প্রতি ঘণ্টায় একটা ট্রেন। অনুমান করা চলে, মানুষের নিত্যপ্রয়োজনে কোনও কাজে লাগবে, এমন উচ্চাশা এই মেট্রো রুটের নেই— এই যাত্রাপথের বহুখণ্ডিত অটো রুটের রুজিরুটিতে মেট্রো হাত দেবে বলে মনে হয় না। তার অস্তিত্বের একমাত্র কারণ হল বিনোদন। দিনকয়েক হল কলকাতায় শীতও পড়েছে জাঁকিয়ে, ফলে ভিক্টোরিয়া-চিড়িয়াখানার পাশাপাশি জোকার টয় ট্রেনও শহরবাসীর আনন্দ-ঠিকানা হয়ে উঠতেই পারে। সোম থেকে শুক্র না চালিয়ে যদি শনি-রবি চালানো হত, তা হলে ফুর্তি জমত আরও। অবশ্য, বাঙালি অফিস কামাই করে আনন্দ করতে জানে; আর, স্কুল-কলেজ-অফিস যাতে কামাই না করতে হয়, তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ছুটিও দিয়ে দিতে পারেন, কিছুই বলা যায় না। যে কোনও ভাবেই হোক, জোকা মেট্রোকে উদ্‌যাপন করা বাঙালির কর্তব্য। এই মেট্রোর মতো চরিত্রে বাঙালি আর ক'টা জিনিসই বা কলকাতায় আছে? তার কোনও তাড়া নেই— যত দূর যাওয়ার ছিল, বারো বছরে তার এক-তৃতীয়ংশ পথ গিয়েই জোকা মেট্রো খুশি। তার হাড়ভাঙা পরিশ্রম নেই— সকাল দশটায় শুরু, বিকেল পাঁচটায় শেষ, মাঝে ভাতঘুমের বিরতি, শনি-রবি ছুটি। এবং, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। জোকা মেট্রো দিল্লির মতো দূরগামী হতে চায়নি, ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর মতো গঙ্গা পারাপারও করতে চায়নি। এমনকি অমলকান্তির মতো রোদ্দুর হতেও না। জোকা মেট্রো শুধু চেয়েছিল, শীতের রোদ মেখে বাঙালি যেন পুত্র-কন্যার হাত ধরে শহরেই টয় ট্রেন চেপে নিতে পারে। গত বছরের শেষে সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে।

জোকা মেট্রো বাংলার মতোও বটে। তার প্রতিশ্রুতি আছে, কোনও এক দিন সে লাইন তারাতলার সীমানা ছাড়িয়ে, ডায়মন্ডহারবার রোডের মায়া কাটিয়ে ধর্মতলার মোড়ে পৌঁছবে। কবে, সে প্রশ্নের উত্তর নেই। সম্ভবত উত্তর খোঁজেও না কেউ। কলকাতা এক দিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে, শুধু এটুকু জেনেই বাংলা খুশি থাকে— কবিকে বলা যায় না প্রতিশ্রুতি পূরণের দিন তারিখ আদালতে হলফনামা পেশ করে জানাতে হবে। তার ধর্মতলায় পৌঁছনোও অবশ্য খণ্ডিত স্বপ্ন। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, বিবাদী বাগ অবধি যাবে এই মেট্রো। স্বপ্নকে কেটেছেঁটে মধ্যবিত্ত মাপে নিয়ে আসতে বাংলা বিলক্ষণ জানে। এই রাজ্যেই কি উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলার স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে যায়নি, সিঙ্গুরে টাটা মোটরস-এর কারখানা হয়ে যায়নি অগভীর মাছের ভেড়ি? কলকাতার জোকা মেট্রো বাংলার মতো— তার অতীত আছে, উত্তরাধিকার আছে, শুধু ভবিষ্যৎ নেই। কলকাতাতেই চালু হয়েছিল দেশের প্রথম মেট্রো রেল। তার পর আরও চোদ্দোটা শহরে মেট্রো চালু হয়ে গেল, লাইনের সংখ্যায় দিল্লি গুনে গুনে দশ গোল দিল, স্টেশনের সংখ্যায় এগিয়ে গেল হায়দরাবাদ-বেঙ্গালুরুও। একদা সেরা হওয়ার গৌরব নিয়ে বাংলা এখন কায়ক্লেশে দিন গুজরান করে। একদা প্রথম হওয়ার গর্ব নিয়ে কলকাতার মেট্রো তার টয় ট্রেনটি পেল।

Air pollution নিম্নতম স্থানে

কলকাতার এক ভয়ঙ্কর সঙ্কট হয়ে দেখা দিচ্ছে বায়ুদূষণ। বাতাসের মানের মূল্যায়ন ফল ভীতিপ্রদ— কেন্দ্রীয় দূষণ পর্ষদের পরিমাপে কলকাতার সাতটি এলাকার পাঁচটিতেই বাতাসের মানের সূচকে 'অত্যন্ত খারাপ' পর্যায় মিলেছে, বাকি দু'টিতে মিলেছে 'তীব্র' পর্যায়, যা সূচকের নিম্নতম মান। যার অর্থ, মানবদেহের পক্ষে বিপজ্জনক কলকাতা শহরের অধিকাংশ অঞ্চলের বাতাস। বিশেষত বাতাসে ভাসমান ক্ষতিকারক কণা পিএম ২.৫ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত মাত্রার থেকে কলকাতায় অনেক বেশি— ২০১৯ সালের একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষা অনুসারে অন্তত আট গুণ বেশি। এর ফলে সুস্থ শরীরেও শ্বাসকষ্ট-সহ নানা অসুখের সূত্রপাত হতে বাধ্য, অসুস্থদের সমস্যা আরও তীব্র হবে। অথচ, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের তৎপরতা আশা জাগায় না। দীপাবলিতে দূষণকারী বাজির প্রকোপ কমেনি, দেখা যায়নি দূষণকারী যান, জ্বালানি প্রতিরোধের চেষ্টা। এই অনিয়ন্ত্রণের ফল চোখের সামনেই রয়েছে— দিল্লি। ভারতের রাজধানীতে প্রতি শীত কালে জনজীবন, জনস্বাস্থ্য কতখানি বিপর্যস্ত হয়, তার প্রমাণ প্রতি বছরই মিলছে। ভারতে সর্বাধিক দূষিত শহরের সূচকে এখনও দিল্লি শীর্ষে, কিন্তু দূষণ বৃদ্ধির হারের নিরিখে কলকাতা ভারতের অন্য শহরগুলিকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। অতিক্রম করেছে গত বছরের দূষণের মাত্রাকেও, বলছে কেন্দ্রের তথ্য। এর পরিবেশগত কারণও রয়েছে— ২০২১-২২ সালের শীতকালে লকডাউনের প্রভাবে কলকাতায় দূষণ কিছু কম ছিল। ২০২২-২৩ সালের শীতে বাতাসে আর্দ্রতাও তার আগের শীতের মরসুমের তুলনায় বেশি হওয়ায়, দূষণকারী ভাসমান কণা বাতাসে এ বছর বেড়েছে। কিন্তু এই সব সমস্যাকে ছাপিয়ে উঠছে যে প্রধান সঙ্কট, তা হল নীতির অভাব। কলকাতার বায়ুদূষণ কমানোর কোনও নিবিড় পরিকল্পনা এখনও অবধি চোখে পড়ছে না।

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের তরফে কলকাতায় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যে প্রধান ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তা হল বিদ্যুৎচালিত বাস রাস্তায় নামানো। সারা দেশে দূষণ কমাতে ৫০ হাজার বিদ্যুৎচালিত বাস কেনার পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্র, এর জন্য ১ হাজার কোটি টাকা ধার্য করেছে। পশ্চিমবঙ্গে ২০২৩ সালের মধ্যে এগারোশো বাস চালু হবে, ঘোষণা করেছে রাজ্য। প্রশ্ন হল, যদি বা এ কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়, তাতে লাভ হবে কতটুকু? সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে অন্তত দশ হাজার বাস নথিভুক্ত কলকাতায়। চলে বিপুল সংখ্যক বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত গাড়ি। ২০০৮ সালে কলকাতা হাই কোর্ট পনেরো বছরের পুরনো গাড়ি বাতিল করতে বলেছিল, ২০২২ সালে জাতীয় পরিবেশ আদালত ফের সেই নির্দেশ দিয়েছে। বাতিলযোগ্য লক্ষাধিক গাড়ি নির্দিষ্টও করেছে পরিবহণ দফতর। কিন্তু কলকাতার যাত্রিবাহী ট্যাক্সি, মালবাহী যানগুলিকে দেখলে সংশয় জাগে, সরকার এই লক্ষ্যে কতটা উদ্যোগী?

তবে কিনা, পরিবহণ নগর-দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ হলেও, একমাত্র কারণ নয়। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে দূষণকারী শিল্প প্রচুর। এলপিজি গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়ায় বাণিজ্যিক ও গার্হস্থ প্রয়োজনে দূষণকারী জ্বালানির ব্যবহার বাড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সেই সঙ্গে, কলকাতায় বড় গাছের সংখ্যা দ্রুত কমছে। কেন্দ্রের একটি রিপোর্ট অনুসারে, ২০১১-২১ সালের মধ্যে কলকাতা তার বনভূমির ৩০ শতাংশ হারিয়েছে। দিল্লির সঙ্গে অনেক সময়ই কলকাতার দূষণের তুলনা চলে, কিন্তু দিল্লির সবুজায়নের সঙ্গে কলকাতা কখনও নিজের তুলনা করে কি? সদিচ্ছা থাকলে রাজ্য অনেক সুসংহত উদ্যোগ করতে পারত। কিন্তু না, স্বল্পমেয়াদি লাভ, ক্ষুদ্র স্বার্থই এখানে গুরুত্ব পায়। মূল্য দেন অগণিত নাগরিক— বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিক।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Green Hydrogen সবুজ প্রতিশ্রুতি

:উষ্ণায়ন ও পরিবেশের উপরে নেতিবাচক প্রভাবের কারণে বহু দিন ধরেই বিশ্ব জুড়ে খোঁজ চলছে জীবাশ্ম জ্বালানির ‘উপযুক্ত’ বিকল্পের। সৌরশক্তি এবং বায়ুশক্তি ইতিমধ্যে প্রচলিত হলেও, ক্ষেত্রবিশেষে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয় এদের অনিয়মিত প্রাপ্তি এবং ঋতু-নির্ভরতা। পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রেও পেরিয়ে গিয়েছে কয়েক দশক। যদিও তা ব্যয়বহুল। বর্তমানে বিদ্যুৎচালিত গাড়ি ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে বটে, কিন্তু চার্জিং-এর বিষয়টি এখনও সহজলভ্য নয়। এমতাবস্থায় দেশের কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তির উৎসের ব্যবহার বাড়াতে গত বছর স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী মোদী ‘ন্যাশনাল হাইড্রোজেন মিশন’-এর কথা ঘোষণা করেন, যার অন্যতম উদ্দেশ্য গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদন। সেই সূত্রেই সম্প্রতি ১৭,৯৪০ কোটি টাকার ‘ন্যাশনাল গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন’ (এনজিএইচ) প্রকল্পে সায় দিল কেন্দ্রীয় সরকার। লক্ষ্য, জ্বালানি হাইড্রোজেন উৎপন্ন করার জন্য যে প্রযুক্তি প্রয়োজন, দেশেই তার উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা।

হাইড্রোজেন গুরুত্বপূর্ণ শিল্প জ্বালানি। সত্তরের দশকে জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি প্রথম জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প রূপে মানুষকে পরিস্রুত জ্বালানির উৎস হিসাবে হাইড্রোজেনের কথা ভাবতে বাধ্য করে। উৎস এবং প্রক্রিয়ার বিচারে বিভিন্ন রং দ্বারা চিহ্নিত করা হয় হাইড্রোজেনকে। যেমন, জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে উৎপন্ন হাইড্রোজেনকে বলা হয় ‘গ্রে হাইড্রোজেন’। বর্তমানে এই ধরনের হাইড্রোজেনই সর্বাধিক উৎপন্ন হয়। অন্য দিকে, প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে উৎপন্ন হাইড্রোজেনকে ‘ব্লু হাইড্রোজেন’ বলে। আর, পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি (সৌর বা বায়ু) ব্যবহার করে জলের তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়, তাকে বলা হয় ‘গ্রিন হাইড্রোজেন’। এখন গ্রিন হাইড্রোজেনকেই ভবিষ্যতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসাবে গণ্য করা যায়। প্রসঙ্গত, ভারতের এনজিএইচ প্রকল্পে পাওয়া যাবে বেশ কিছু সুবিধাও। যেমন, গ্রিন হাইড্রোজেন এবং তার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র রফতানির সুযোগ বাড়বে। শিল্প, শক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রের কার্বন উৎপাদন ও নিঃসরণ হ্রাস পাবে। কমবে জীবাশ্ম জ্বালানি-নির্ভরতাও। আমদানি ব্যয় হ্রাস পাবে। যদিও গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি এখনও ব্যয়বহুল, তবে মনে রাখা দরকার যে, সৌরশক্তি এক সময় ব্যয়সাপেক্ষ হলেও গত কয়েক বছরে প্রযুক্তির উন্নতি এবং বিভিন্ন দেশে চাহিদার কারণে সোলার ফোটোভোল্টাইক সেল-এর দাম আশি থেকে নব্বই শতাংশ কমে যায়। এই মূল্যহ্রাসের পরেই দেরিতে হলেও ভারত সৌরশক্তি বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল।

বিশ্ব জুড়ে গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি এখনও প্রাক্-প্রথমিক স্তরে থাকলেও এই প্রকল্পে ভারত যোগ দিচ্ছে দ্রুত। আশার কথা, প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থের সিংহভাগই ব্যয় করা হবে দেশীয় পদ্ধতিতে গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদনের উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপরে। জোর দেওয়া হবে এমন প্রযুক্তি তৈরির গবেষণা ও উন্নয়নের উপরে, যা বিশ্বের অন্যান্য প্রযুক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। নিঃসন্দেহে এটি সরকারের এক ইতিবাচক পদক্ষেপ। প্রকল্পটি সফল হলে জলবায়ু বাঁচানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকাটি পালন করতে সফল হবে ভারত।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Cesarean Delivery অপচয়

ভারতে প্রসবের জন্য অস্ত্রোপচারের (সিজ়ারিয়ান সেকশন) হার অত্যধিক, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রিপোর্টে তা ফের স্পষ্ট হল। উত্তর ভারতের গোবলয়ের রাজ্যগুলির তুলনায় দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে, এবং সরকারি হাসপাতালের চাইতে বেসরকারি হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের হার অনেক বেশি। অর্থাৎ, প্রসূতির পরিবারের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে অস্ত্রোপচারের একটি সুনির্দিষ্ট সংযোগ রয়েছে। নিরাপদ প্রসবের প্রয়োজনের চেয়ে পরিবারের ক্রয়ক্ষমতার সঙ্গে অস্ত্রোপচারের সংযোগ বেশি ঘনিষ্ঠ, এই তথ্য ভারতীয় চিকিৎসাব্যবস্থার প্রকৃত চেহারাটি স্পষ্ট করে। এক দিকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার চাহিদা উপেক্ষিত হচ্ছে, অন্য দিকে জোগানের তাগিদে তৈরি হচ্ছে কৃত্রিম চাহিদা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, দশ থেকে পনেরো শতাংশ প্রসবে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হওয়ার কথা। কোনও কোনও রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতালে চিত্রটি একেবারে বিপরীত। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে প্রায় চুরাশি শতাংশ প্রসব হচ্ছে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে। এমন একটা বিভ্রম তৈরি হয়েছে যে, স্বাভাবিক প্রসবের তুলনায় অস্ত্রোপচারে ঝুঁকি কম, মা ও শিশুর পক্ষে তা বেশি নিরাপদ। ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল— স্বাভাবিক প্রসবের যন্ত্রণা সত্ত্বেও প্রসূতি দ্রুত সেরে ওঠেন, দীর্ঘমেয়াদি জটিলতার সম্ভাবনা কম থাকে। কোনও উন্নত দেশে অস্ত্রোপচারের বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে তা করা হয় না। ভারতে দেখা যাচ্ছে, অস্ত্রোপচারে প্রসবকে ‘স্বাভাবিক’ বলে তুলে ধরা হচ্ছে বিত্তবানদের কাছে।

এই ‘স্বাভাবিকীকরণ’-এর প্রক্রিয়ার শরিক হয়েছে সরকারি হাসপাতালগুলিও। পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের নানা রাজ্যে সরকারি হাসপাতালেও অস্ত্রোপচারে প্রসবের হার প্রত্যাশিত হারের তুলনায় অনেক বেশি। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের অর্থলাভের সম্ভাবনা না থাকলেও, সময় বাঁচানোর তাগিদ থাকে। যাঁরা নৈতিক আচরণে আগ্রহী, তাঁদের কাছেও স্বাভাবিক প্রসবের নির্বাচন ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ মনে হতে পারে, কারণ প্রসূতির অবস্থার নিয়মিত নজরদারির দায়িত্ব চিকিৎসকের উপরেই বর্তায়। যথেষ্ট প্রশিক্ষিত কর্মী না থাকলে তাঁরা ভরসা পান না। দায় রয়েছে স্বাস্থ্য বিমার শর্তেরও। পশ্চিমবঙ্গে যেমন ‘স্বাস্থ্যসাথী’ বিমায় সিজ়ারিয়ান সেকশন কেবল সরকারি হাসপাতালে করার নির্দেশ রয়েছে, অস্ত্রোপচার আদৌ প্রয়োজন ছিল কি না, সে প্রশ্ন তোলার রীতি নেই। বেসরকারি বিমায় তো কখনওই সে প্রশ্ন ওঠেনি। ফলে সব দিক থেকেই অস্ত্রোপচারে প্রসব ‘লাভজনক’ মনে হতে থাকে চিকিৎসাপ্রার্থী এবং চিকিৎসকের কাছে।

এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার দায় অনেকটাই বর্তায় চিকিৎসক সমাজের উপর, যার প্রতিনিধি চিকিৎসক সংগঠনগুলি। চিকিৎসকদের স্বার্থরক্ষাই তাদের একমাত্র কাজ হতে পারে না, চিকিৎসাব্যবস্থায় পেশাদারিত্ব ও ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ স্থাপন করাটাও সংগঠনগুলির কর্তব্য। দায় সরকারেরও— ভারতে সরকারি হাসপাতালগুলিই বরাবর চিকিৎসার আদর্শ মান বেঁধে দিয়েছে। সেখানে চিকিৎসাপ্রার্থীর নিরাপত্তাই প্রথম ও শেষ কথা। চিকিৎসকের সুবিধে প্রধান বিবেচ্য নয়। সুলভ ওযথাযথ চিকিৎসার উপযোগী পদ্ধতিতে ফিরতে হবে সরকার ও চিকিৎসক সমাজকে।

Road accidents প্রাণ হাতে পথে

উদ্দেশ্য মহৎ হলেই যে উদ্দেশ্য পূরণের পথটিও যুক্তিগ্রাহ্য হবে, তেমন কোনও কথা নেই। কলকাতায় যেমন পথ দুর্ঘটনা হ্রাস করতে হামেশাই পুলিশকে যে ধাতব গার্ডরেল ব্যবহার করতে দেখা যায়, তা যথেষ্ট বিপজ্জনক। ব্যস্ত রাস্তায় গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ জরুরি। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানই বলে দেয় যে, ধাতব গার্ডরেল রাস্তার মাঝখানে বসানো থাকলে তাতে ধাক্কা লেগে মারাত্মক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বাড়ে। এই কাণ্ডজ্ঞানের কথাটি দৃশ্যত কলকাতা পুলিশের মাথায় আসেনি। আইআইটি খড়্গপুরের এক বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিলেন, রাস্তায় গতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্লাস্টিক, ফাইবার অথবা বিশেষ ভাবে তৈরি রাবার দিয়ে নির্মিত বস্তু ব্যবহার করা বিধেয়। এবং, এগুলির রং হিসাবে হলুদ-কালো ব্যবহার করা প্রয়োজন। হলুদ-কালো সমস্ত আবহাওয়াতে, কুয়াশাঢাকা পথেও দূর থেকে দৃশ্যমান হয়। অন্য রঙে, এমনকি শাসক দলের বিশেষ পছন্দের নীল-সাদাতেও, সেই সুবিধা মেলে না।

এই আপাত তুচ্ছ বিষয়গুলি পথ-নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই গুরুত্ব পায় না। কিন্তু এগুলি জরুরি। কিছু দিন পূর্বে কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রক ২০২১ সালের দেশব্যাপী পথ-দুর্ঘটনার যে হিসাব দিয়েছে, তাতে স্পষ্ট শুধুমাত্র ওই একটি বছরেই সড়ক-দুর্ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গে প্রাণ হারিয়েছেন ৫৮০০ জন। এই চিত্র আতঙ্কের। সুতরাং, পুলিশ-প্রশাসনের এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে দুর্ঘটনা এবং আহত-নিহতের তালিকা আরও বৃদ্ধি পায়। মনে রাখা প্রয়োজন, পথ-নিরাপত্তা ব্যবস্থাটি শুধুমাত্র যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণেই সীমাবদ্ধ নয়, তা এক সার্বিক ব্যবস্থা, যেখানে প্রশাসন এবং নাগরিক— উভয়ের সদিচ্ছা একান্ত কাম্য। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বলতেই হয়, কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যেই পথ-সুরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বিরাট ফাঁক থেকে গিয়েছে। কলকাতা শহরে রাতে বেপরোয়া গাড়ি চালানো, উৎসবের দিনে ন্যূনতম বিধি না মেনে বাইক-গাড়ির তাণ্ডব— বছরের পর বছর এই চিত্রে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ধরা পড়ে না, এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা চলে পুলিশ-প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে; জেলার দিকে তেমনই তাপ্পি দেওয়া টায়ার, ভাঙা কাঠামো এবং অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে চলে বাস, অটো। সুতোয় ঝোলে যাত্রী ও পথচারীর ভাগ্য। অথচ, রাজ্যে নির্দিষ্ট আইন আছে, আইনভঙ্গে শাস্তির বিধান আছে। কিন্তু যে রাজ্যে আইন ভাঙার অধিকার কাঞ্চনমূল্যে ক্রয় করা যায়, সেখানে নাগরিকদের কাছে পথ প্রকৃতই সুরক্ষিত কি না, প্রশ্ন থেকে যায়।

অবশ্য সব দায় প্রশাসনের উপর চাপানো চলে না। এক শ্রেণির নাগরিকের অসচেতনতা এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণও বিপদের জন্য সমান ভাবে দায়ী। ফুটপাত সত্ত্বেও রাস্তায় নেমে আসা, সিগন্যালের তোয়াক্কা না করা, ব্যক্তিগত যানের গতির সীমারেখা না মানা তারই যৎসামান্য উদাহরণ। কিন্তু এ কথাও সত্য, প্রশাসন স্বয়ং যদি পথ-নিরাপত্তা বিষয়ে ঢিলেঢালা হয়, তবে নাগরিকও অচিরেই সেই পথের শরিক হবে। অন্যায় করেও সহজে পার পাওয়া গেলে অনিয়মই নিয়ম হবে। পথকে নিরাপদ বানাতে হলে এক দিকে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শমতো যান নিয়ন্ত্রণ বিধিকে ঢেলে সাজাতে হবে, অন্য দিকে আইন প্রয়োগে কঠোর হতে হবে। তবে, সর্বাগ্রে এই ক্ষেত্র থেকে অন্তত দলীয় পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বাদ দিতে হবে।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Hooch অপরাধের নেশা

চোলাই মদ এবং সমাজবিরোধীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটি ইতিপূর্বে এ রাজ্যে বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত। সুতরাং, সম্প্রতি উলুবেড়িয়ায় যে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটল, তাকে বিচ্ছিন্ন বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা বলে মনে করার কোনও কারণ নেই। বরং ঘটনাটিকে চোলাইয়ের ঠেক এবং সমাজবিরোধী কাজকর্মের বাড়বাড়ন্তের দীর্ঘ ধারাবাহিকতায় এক নতুন সংযোজন বলা চলে। সেখানে দুই মত্ত যুবক কিশোরী কন্যার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করায় বাধা দেন মেয়েটির বাবা। এই 'অপরাধ'-এ পিটিয়ে খুন করা হল তাঁকে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই এলাকায় বহু চোলাইয়ের ঠেক চলে। দিনের বেলায় প্রকাশ্যে বসে মদ্যপানের আসর। পরিস্থিতি এমনই দুর্বিষহ যে, সন্ধ্যার পর মেয়েরা রাস্তায় বেরোতে ভয় পান।

হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে চোলাই মদের ভাটির কথা অজানা নয়। অতি সম্প্রতি এই জেলারই নাজিরগঞ্জে কার্যত বাড়ির দোরগোড়ায় মদ বিক্রি ও মদের আসর বসানোর প্রতিবাদ করতে গিয়ে খুন হতে হয়েছে এক ব্যবসায়ীকে। ২০২০ সালে এক কলেজছাত্রীর যৌন হেনস্থা রুখতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন তাঁর মা। কিছু কাল পূর্বে সংবাদে প্রকাশিত হয়েছিল, উলুবেড়িয়ার এখনও কিছু গ্রামে চোলাই মদ তৈরি কুটির শিল্পের পর্যায়ে রয়ে গিয়েছে। ঘরে ঘরে তা তৈরি হয়, পৌঁছে যায় জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। প্রশ্ন হল, প্রশাসন তবে কী করছে? প্রশাসন যে চোলাই রুখতে কোনও পদক্ষেপ করেনি, তা নয়। বিভিন্ন জায়গায় নিয়মিত পুলিশের অভিযান চলে, ধরপাকড় হয়। কিন্তু কিছু কাল পরেই পূর্বাবস্থা ফিরে আসে। ভাটি ভেঙে দিলে বাইরে থেকে চোলাই এনে বিক্রি করা হয়। উলুবেড়িয়ার যে অঞ্চলে খুনের ঘটনাটি ঘটেছে, সেখানে নিত্য দিন মদ খাওয়া এবং বিক্রি নিয়ে অশান্তি চলে বলে অভিযোগ। অথচ পুলিশের দাবি, সেখানে বছরভর অভিযান চালানো হয়। এ-ক্ষণে পুলিশের ভাবা প্রয়োজন, বছরভর অভিযান চালিয়েও যদি প্রকৃত সমস্যার সুরাহা না হয়, তবে সে অভিযানের উদাহরণ অপ্রয়োজনীয়। বরং, শুধুমাত্র অভিযানের ভরসায় নিশ্চিন্ত না থেকে বছরভর নজরদারি এবং উপদ্রুত অঞ্চলগুলিতে পুলিশ প্রহরা বৃদ্ধি করা জরুরি। চোলাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযান এবং প্রচারকার্য চালানোর পরও যে এমন ঘটনা নিয়মিত ঘটছে, তা যথেষ্ট উদ্বেগের।

চোলাই মদ তৈরি এবং বিক্রির সঙ্গে মেয়েদের সামাজিক এবং আর্থিক নিরাপত্তার প্রশ্নটি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। নেশার ঠেকগুলির আশেপাশে মেয়েদের যৌন হেনস্থার ঘটনা হামেশাই ঘটে। পরিবারেও নেশাগ্রস্ত স্বামীর হাতে মেয়েদের নিয়মিত প্রহৃত হতে হয়। অভাবের সংসারে যৎসামান্য রোজগার চোলাইয়ের ঠেকে উড়িয়ে এলে আর্থিক সঙ্কট বাড়ে। এই সমস্যাগুলির হাত থেকে পরিত্রাণ পেতেই এক সময় বিভিন্ন অঞ্চলের মহিলারা উদ্যোগী হয়ে প্রমীলা বাহিনী গড়ে চোলাইয়ের ঠেক ভাঙার অভিযান শুরু করেছিলেন। তাঁদের নিরন্তর লড়াইয়ে বহু জায়গায় সাফল্যও এসেছে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সহায়তা মিললেও সর্বত্র তা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ। মনে রাখতে হবে, চোলাই এবং তাকে ঘিরে ঘটে চলা অপরাধের বৃত্ত এক সামাজিক সমস্যা। সুতরাং, সমস্ত পক্ষকে একজোট হয়ে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে হবে। নয়তো সম্মান এবং প্রাণহানি— কোনওটাই আটকানো যাবে না।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Botanical Garden বিপন্ন সম্পদ

বিপন্ন শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেন, গঙ্গার ভয়াবহ ভাঙনে। গঙ্গা যে ভাবে তার পশ্চিম তীর ভাঙতে ভাঙতে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে অবিলম্বে ওই উদ্যান এবং সংলগ্ন বসতি অঞ্চলের অনেকটাই তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। ইতিমধ্যেই ভাঙনের কারণে এই ঐতিহ্যশালী উদ্যানের অনেক বড় গাছের নীচের মাটি সরে গিয়েছে। সেগুলি হয় উপড়ে পড়েছে, নয়তো দুর্বল হয়ে পতনের প্রহর গুনছে। এই বিপন্নতারই পরিপ্রেক্ষিতে মামলা দায়ের হয়েছিল জাতীয় পরিবেশ আদালতে। প্রথম শুনানিতে পরিবেশ আদালত মামলার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত পক্ষকে আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এই উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বটি বর্তমানে কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের অধীনে বটানিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া-র উপর ন্যস্ত। সুতরাং, সাম্প্রতিক মামলার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ আদালতের পক্ষ থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রকে হলফনামা দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজ অবস্থান জানানোর কথা বলা হয়েছে।

বটানিক্যাল গার্ডেনের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের কারণটি স্পষ্ট। অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং তজ্জনিত দূষণের ধাক্কায় যখন কলকাতা, হাওড়া-সহ সমস্ত বড় শহর ধুঁকছে, তখন সবুজে মোড়া বটানিক্যাল গার্ডেন কিছু স্বস্তির অক্সিজেন সরবরাহ করে। কিন্তু সেই স্বস্তি যাতে বজায় থাকে, তার জন্য যথাযথ দায়িত্ব পালন করা হয় কি? গঙ্গার ভাঙন রাতারাতি আসে না। তা এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া। গঙ্গা থেকে যে খাল স্বর্ণময়ী রোডের দিকে গিয়েছে, তার দু'পাশ ভাঙতে ভাঙতে গঙ্গা প্রায় আধ কিলোমিটার এগিয়ে গিয়েছে। কিছু জায়গায় গাছপালা-সমেত জমিও গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। ভাঙন রুখতে গঙ্গাতীরের একাংশে কংক্রিটের বাঁধ দেওয়া হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। ফলে, পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা বিশদে আলোচনা প্রয়োজন। ২৭৩ একর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই সুবিশাল উদ্যান রাজ্যের গর্ব। বহু দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য উদ্ভিদের ঠিকানা। তাই তাকে বাঁচাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। ২০২০ সালের আমপান ঘূর্ণিঝড়ে উদ্যানের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। অতঃপর গঙ্গার ভাঙনে যদি বিভিন্ন জায়গা তলিয়ে যায়, তবে সামগ্রিক ভাবে রাজ্যের পরিবেশের পক্ষে দুঃসংবাদ।

এ প্রসঙ্গে গঙ্গার নাব্যতা হ্রাসের প্রসঙ্গটিও উল্লেখযোগ্য। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় গঙ্গা পরিষদের অন্যতম সদস্য রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। অথচ, সেই রাজ্যেই এক দিকে গঙ্গার ভাঙনে একের পর অঞ্চল তলিয়ে যায়, অন্য দিকে গঙ্গার পলি তোলার কাজটিও যথাযথ হয় না। কলকাতা বন্দর গঙ্গার পলি নিষ্কাশনের কাজ করলেও তার পরিসর যথেষ্ট সীমিত। এবং পরিবেশবিদদের একাংশের দাবি, পলি নিষ্কাশন করে বন্দর কর্তৃপক্ষ গঙ্গাতেই ফেলে রাখায় নদীর নাব্যতা কমে যায়। সুতরাং, একই মামলায় বটানিক্যাল গার্ডেনের সঙ্গে গঙ্গার ভাঙনের বিষয়টিকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। হলফনামা জমা দিতে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকেই। কিন্তু গঙ্গার ভাঙন বা বিপন্নতা সংক্রান্ত আলোচনাগুলি নতুন নয়। এই সংক্রান্ত বহু প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, উপযুক্ত পদক্ষেপের বহু আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। অথচ ক্ষতির পরিমাণ কমেনি। বিপদ এখন রাজ্যের অমূল্য সম্পদে আঘাত হেনেছে। কত দ্রুত সেই বিপদ-মুক্তি ঘটে, তা-ই দেখার।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

নিয়ন্ত্রণের বাসনা

হচ্ছিল অনলাইন জুয়া সংক্রান্ত আইনের আলোচনা। কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড ইনফর্মেশন টেকনোলজি মন্ত্রক তথ্যপ্রযুক্তি আইনের সেই খসড়া সংশোধনীর পাদটীকা হিসাবে জুড়ে দিল একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন শর্ত— অতঃপর প্রেস ইনফরমেশন বুরো (পিআইবি) বা অন্য কোনও সরকার-মনোনীত সংস্থা এই ক্ষমতার অধিকারী হবে যে, তারা কোনও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সরকার সংক্রান্ত কোনও তথ্যকে ‘ফেক নিউজ়’ বা ভুয়ো খবর বলে চিহ্নিত করলে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটের পরিচালকদের সেই সংবাদটি সরিয়ে নিতে হবে। বর্তমান সময়ে ভুয়ো খবরের বিপদ নিয়ে কোনও সংশয় নেই, তাকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তাও প্রশ্নাতীত। কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ পিআইবি-র হাতে সে-হেন দায়িত্ব অর্পণ ভুয়ো খবর নিয়ন্ত্রণে যতখানি সচেষ্ট বা সক্ষম হবে, সরকার-বিরোধী কণ্ঠস্বর দমনে তার চেয়ে অনেক বেশি তৎপর হবে কি না, সেই প্রশ্নটিকে উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ বর্তমান ভারতে নেই। শুধু সোশ্যাল মিডিয়া নয়, আজ দেশের প্রায় সব সংবাদমাধ্যম অনলাইনে উপস্থিত। এই অবস্থায় পিআইবি বা সরকার-মনোনীত অন্য কোনও সংস্থার যদি এই অধিকার থাকে যে, তারা যে কোনও সংবাদকে সরিয়ে নিতে বলতে পারে, তা এক বিপুল সেন্সরশিপ-এর জন্ম দেবে। কোন সংবাদ প্রকাশিত হবে, আর কোনটি হবে না, তার নিয়ন্ত্রণ পিআইবি-র বকলমে সরকারের হাতে থাকবে। উল্লেখ্য যে, পিআইবি এখনই ভুয়ো তথ্য চিহ্নিত করার কাজ করে। একাধিক দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেখানে পিআইবি যথাযথ সংবাদকে ভুয়ো খবর হিসাবে চিহ্নিত করেছে। তার হাতে সেন্সরশিপের এমন প্রবল ক্ষমতা তুলে দেওয়া সুবিবেচনার পরিচয় হতে পারে না।

এই খসড়া সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে, পিআইবি বা সরকার-মনোনীত অন্য কোনও সংস্থা যে ভুয়ো খবর অপসারণের নির্দেশ দিতে পারে, সেগুলি সরকারের কাজকর্ম সংক্রান্ত। আশঙ্কা হয়, সরকারের পক্ষে যে সংবাদ বা মতামত যথেষ্ট ইতিবাচক হিসাবে বিবেচিত হবে না, সেগুলি ‘ভুয়ো’ হিসাবে চিহ্নিত হবে। প্রবণতাটির মধ্যে কর্তৃত্ববাদী শাসনের চরিত্রলক্ষণ স্পষ্ট। সরকার সম্বন্ধে সমালোচনার ক্ষেত্রে বর্তমান শাসকদের অসহিষ্ণুতা ইতিমধ্যেই বহু বার প্রকট হয়েছে। এমনকি, সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম কোনও বিচারপতির বিষয়ে সুপারিশ করার পরও কেন্দ্রীয় সরকার আপত্তি জানিয়ে বলেছে যে, তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে সমালোচনামূলক সংবাদ শেয়ার করেছেন! অনুমান করা চলে যে, পিআইবি-র হাতে যে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার কথা বিবেচনা করছে কেন্দ্র, তা সমালোচনা দমন করার এই মানসিকতাকেই আরও পরিপুষ্ট করবে।

আশঙ্কা হয়, সরকারের লক্ষ্য হল নাগরিকের বাক্‌স্বাধীনতা হরণ। গণতন্ত্রে বাক্‌স্বাধীনতার গুরুত্ব সংবিধানের ১৯ ধারায় স্বীকৃত। সেই স্বাধীনতা অবশ্যই অ-বাধ নয়। ১৯(২) ধারায় নির্দেশ রয়েছে, দেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, আইনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও আদালত অবমাননার প্রশ্নে নাগরিকের বাক্‌স্বাধীনতা খণ্ডন করতে পারে সরকার। লক্ষণীয় যে, সরকারের সমালোচনাকে দমন করার জন্য বাক্‌স্বাধীনতা হরণের অধিকার সংবিধান দেয়নি। সুপ্রিম কোর্ট তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬এ ধারাকে অবৈধ ঘোষণা করেছিল, কারণ আদালতের মতে তা যে ভাবে নাগরিকের বাক্‌স্বাধীনতা হরণ করে, তার অধিকার সংবিধানের ১৯(২) ধারা দেয়নি। পিআইবি-র হাতে সেন্সরশিপের ক্ষমতা তুলে দিয়ে সরকার যে পথে হাঁটার কথা ভাবছে, তা সংবিধানস্বীকৃত কি না, সেই বিচারের অধিকার শীর্ষ আদালতের। কিন্তু, নিয়ন্ত্রণের এই প্রবণতাকে বারংবার প্রশ্ন করা নাগরিকের কর্তব্য। ক্ষমতাবানকে অপ্রিয় প্রশ্ন করতে পারার স্বাধীনতাই গণতন্ত্রকে অর্থপূর্ণ রাখতে পারে।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Road accident প্রাণ হাতে পথে

উদ্দেশ্য মহৎ হলেই যে উদ্দেশ্য পূরণের পথটিও যুক্তিগ্রাহ্য হবে, তেমন কোনও কথা নেই। কলকাতায় যেমন পথ দুর্ঘটনা হ্রাস করতে হামেশাই পুলিশকে যে ধাতব গার্ডরেল ব্যবহার করতে দেখা যায়, তা যথেষ্ট বিপজ্জনক। ব্যস্ত রাস্তায় গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ জরুরি। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানই বলে দেয় যে, ধাতব গার্ডরেল রাস্তার মাঝখানে বসানো থাকলে তাতে ধাক্কা লেগে মারাত্মক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বাড়ে। এই কাণ্ডজ্ঞানের কথাটি দৃশ্যত কলকাতা পুলিশের মাথায় আসেনি। আইআইটি খড়্গপুরের এক বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিলেন, রাস্তায় গতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্লাস্টিক, ফাইবার অথবা বিশেষ ভাবে তৈরি রাবার দিয়ে নির্মিত বস্তু ব্যবহার করা বিধেয়। এবং, এগুলির রং হিসাবে হলুদ-কালো ব্যবহার করা প্রয়োজন। হলুদ-কালো সমস্ত আবহাওয়াতে, কুয়াশাঢাকা পথেও দূর থেকে দৃশ্যমান হয়। অন্য রঙে, এমনকি শাসক দলের বিশেষ পছন্দের নীল-সাদাতেও, সেই সুবিধা মেলে না।

এই আপাত তুচ্ছ বিষয়গুলি পথ-নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রেই গুরুত্ব পায় না। কিন্তু এগুলি জরুরি। কিছু দিন পূর্বে কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রক ২০২১ সালের দেশব্যাপী পথ-দুর্ঘটনার যে হিসাব দিয়েছে, তাতে স্পষ্ট শুধুমাত্র ওই একটি বছরেই সড়ক-দুর্ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গে প্রাণ হারিয়েছেন ৫৮০০ জন। এই চিত্র আতঙ্কের। সুতরাং, পুলিশ-প্রশাসনের এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে দুর্ঘটনা এবং আহত-নিহতের তালিকা আরও বৃদ্ধি পায়। মনে রাখা প্রয়োজন, পথ-নিরাপত্তা ব্যবস্থাটি শুধুমাত্র যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণেই সীমাবদ্ধ নয়, তা এক সার্বিক ব্যবস্থা, যেখানে প্রশাসন এবং নাগরিক— উভয়ের সদিচ্ছা একান্ত কাম্য। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বলতেই হয়, কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যেই পথ-সুরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বিরাট ফাঁক থেকে গিয়েছে। কলকাতা শহরে রাতে বেপরোয়া গাড়ি চালানো, উৎসবের দিনে ন্যূনতম বিধি না মেনে বাইক-গাড়ির তাণ্ডব— বছরের পর বছর এই চিত্রে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ধরা পড়ে না, এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা চলে পুলিশ-প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে; জেলার দিকে তেমনই তাপ্পি দেওয়া টায়ার, ভাঙা কাঠামো এবং অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে চলে বাস, অটো। সুতোয় ঝোলে যাত্রী ও পথচারীর ভাগ্য। অথচ, রাজ্যে নির্দিষ্ট আইন আছে, আইনভঙ্গে শাস্তির বিধান আছে। কিন্তু যে রাজ্যে আইন ভাঙার অধিকার কাঞ্চনমূল্যে ক্রয় করা যায়, সেখানে নাগরিকদের কাছে পথ প্রকৃতই সুরক্ষিত কি না, প্রশ্ন থেকে যায়।

অবশ্য সব দায় প্রশাসনের উপর চাপানো চলে না। এক শ্রেণির নাগরিকের অসচেতনতা এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণও বিপদের জন্য সমান ভাবে দায়ী। ফুটপাত সত্ত্বেও রাস্তায় নেমে আসা, সিগন্যালের তোয়াক্কা না করা, ব্যক্তিগত যানের গতির সীমারেখা না মানা তারই যৎসামান্য উদাহরণ। কিন্তু এ কথাও সত্য, প্রশাসন স্বয়ং যদি পথ-নিরাপত্তা বিষয়ে ঢিলেঢালা হয়, তবে নাগরিকও অচিরেই সেই পথের শরিক হবে। অন্যায় করেও সহজে পার পাওয়া গেলে অনিয়মই নিয়ম হবে। পথকে নিরাপদ বানাতে হলে এক দিকে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শমতো যান নিয়ন্ত্রণ বিধিকে ঢেলে সাজাতে হবে, অন্য দিকে আইন প্রয়োগে কঠোর হতে হবে। তবে, সর্বাগ্রে এই ক্ষেত্র থেকে অন্তত দলীয় পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বাদ দিতে হবে।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER dot COM -

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Practice Batch - ₹ 100 per month

WBCS Bengali Compulsory Paper .com
https://wbcsbengalicompulsorypaper.com

নিয়মিত অনুশীলন

PRACTICE BATCH

- ❑ Live practice
- ❑ Friday & Monday 9.30 pm
- ❖ *Print করে খাতা দেখা হবে /*
- ❖ *সাথে উত্তরপত্র*

❖Practice - ₹ *100*/month
❖WhatsApp: 7047352328
By Pathak sir

WBCS English Compulsory
&
WBCS Bengali Compulsory

Practice Batch - ₹200 per month

WBCS Bengali Compulsory Paper .com
https://wbcsbengalicompulsorypaper.com

নিয়মিত অনুশীলন

PRACTICE BATCH

- ❑ Live practice
- ❑ Friday & Monday 9.30 pm
- ❖ *Print করে খাতা দেখা হবে /*
- ❖ *সাথে উত্তরপত্র*

❖Practice - ₹ *200*/month
❖WhatsApp: 7047352328
By Pathak sir